গল্প

সতী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

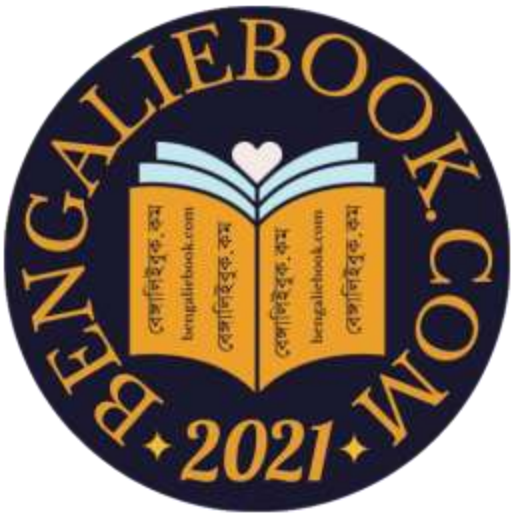

সতী

এক

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভাল উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। শহরের কোন কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে 'দুর্নীতি-দমন' সমিতির কার্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোনমতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোটবোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি ঘটে।

স্ত্রী নির্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিল, কহিল, কালকের কাগজে দেখলাম আমাদের লাবণ্যপ্রভা আসছেন এখানকার মেয়ে-ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্ট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা লাবণ্য নাম এমন ত কত আছে বৌদি!

নির্মলা বলিল, তা আছে। ওঁকে জিজ্ঞেসা করছি।

হরিশ মুখ তুলিয়া সহসা কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি জানব কি ক'রে শুনি? গভর্নমেন্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, আহা, রাগ কর কেন, রাগের কথা ত বলিনি। তোমার তদবির তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে ত আহ্লাদের কথা। এই বলিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি মন্থর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না—উঠো না—

হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল—নাঃ, শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। উঃ! আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর মধুর কণ্ঠ কানে গেল, তুমি কোন্ দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে সে একদিন জগৎ দেখবে।

এইখানে হরিশের একটু পূর্ববৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিল সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সব-জজ। হরিশ এম. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার মেস ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহঙ্কার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসত পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদরআলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাকওয়ালা মুন্সেফ, দাড়ি-ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সরকারী উকিল এবং শহরের অন্যান্য মান্যগণ্যের দল সন্ধ্যার পরে কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিল। সদরআলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। অতএব আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইত ধর্ম সম্বন্ধে। এবং যেমন সর্বত্র ঘটে, এখানেও তেমনি অধ্যাত্ম-তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা সমাধা হইত খণ্ডযুদ্ধের অবসানে।

সেদিন এমনি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনদিন তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা

শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হউক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাকওয়ালা মুন্সেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। ইহার কারণ, এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইঁহার সহিত তর্ক চলে না। সবাই খুশি হইলেন, হইলেন না শুধু সব-জজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য? এবং বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাঁহার পরম প্রিয় সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুনলেন ত ভাদুড়ীমশাই! ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!

ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, তা বটে! কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্থ। আগে মাস্টারি করত কিনা।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন, ও জানার মুখে আগুন। এরাই হ' ল জ্ঞানপাপী। এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এই স্বল্পভাষী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং, পিতার অভিমত যাহাই হউক, পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন। এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যের সহিত হরিশের পরিচয় হইল। সেও আই এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল। সেইদিন হইতে প্রতিদিনের আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থই শুধু জানিল না, আরও একটা জটিলতর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইল যাহা তত্ত্ব হিসাবে ঢের বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ক্রমশঃ পরীক্ষার

দিন কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালই দিল এবং ভাল করিয়াই পাশ করিল।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইল, হরিশ সমবেদনায় মুখ পাংশু করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ফেল করলেন যে বড়?

লাবণ্য কহিল, এ-টুকুও পারব না, আমি এতই অক্ষম?

হরিশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হবার হয়েছে, এবার কিন্তু খুব ভাল করে একজামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, খুব ভাল করে দিলেও আমি ফেল হবো। ও আমি পারব না।

হরিশ অবাক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, পারবেন না কি রকম?

লাবণ্য জবাব দিল, কি রকম আবার কি? এমনি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে রামমোহনবাবু মকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে তাহার আর কোথাও কোন কূল-কিনারা না থাকে, এই শুভ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিদায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দযোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধ করি তিনি এতখানি বিচলিত হইতেন না। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি! এত বড়–! ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর যোগাইল না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকিলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্মার্থ ও পেনশনান্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোটমেয়ে নির্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি দেখিতে ভাল; দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন,—বল কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজকালকার ছেলে—

কর্তা কহিলেন, কিন্তু আমি ত আজকালকার বাপ নই? আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ যদি না হয় আর কোন উপায় দেখতে ব'লো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন।

কর্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশও শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন এবং আশীর্বাদের কাজটাও এই সঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী

বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, এবং ইংরাজী শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ কীর্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকরি দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোন গুণ নাই। আজকাল দিনক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজী না পড়াইলে চলে না, কিন্তু যে মূর্খ এই ম্লেচ্ছ বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিল না; সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং যথাকালে শুভকর্ম সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিল না। কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে মৈত্রগৃহিণী—নির্মলার সতী-সাধ্বী মাতাঠাকুরানী—বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন, বলিলেন, মা, পুরুষমানুষকে চোখে চোখে না রাখলেই সে গেল। সংসার করতে আর যা-ই কেননা ভোল কখনো এ কথাটি ভুলো না।

তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্র বুড়া চিতায় শয়ন না করিলে আর তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

নির্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিল এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে কত পরিবর্তন, কত কি ঘটিল। রায়বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্মনিষ্ঠ মৈত্র গতাসু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যর অন্যত্র বিবাহ হইল, জুনিয়ার উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তাঁহার যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িল, কিন্তু নির্মলা আর তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র এ জীবনে ভুলিল না।

দুই

এই সজীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এত সত্বর শুরু হইবে তাহা কে জানিত! রায়বাহাদুর তখনও জীবিত, পেনশন লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভাল কীর্তনওয়ালী আসিয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল কাজকর্ম অন্তে একদিন ভাল করিয়া তাহার কীর্তন শোনা। পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইল; শুনিয়া বাড়ি ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্মলা উপরের খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, গান লাগল কেমন?

হরিশ খুশি হইয়া কহিল, খাসা গায়।

দেখতে কেমন?

মন্দ না, ভালই।

নির্মলা কহিল, তা হলে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই ত পারতে।

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, কি রকম?

নির্মলা সক্রোধে বলিল, রকম ভালই। আমি কচি খুকি নই, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে কহিল, তুমি করচ কি বৌদি? বাবা শুনতে পাবেন যে!

নির্মলা জবাব দিল, পেলেনই বা শুনতে! আমি ত চুপি চুপি কথা কইচি নে।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই জোড়হাতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া কহিল, রক্ষে কর বৌদি, এত রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারি ক'রো না।

বধূর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িল বৈ কমিল না, কহিল, কিসের কেলেঙ্কারি! তুমি বলবে না কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা ত আর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে না! বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

হরিশ কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে নীচে আসিয়া বাকি রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইল। অতঃপর দিন-দশেকের মত উভয়ের বাক্যালাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায় না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিল। বন্ধুরা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যত বুড়ো হ' চ্চো, রোগও যে তত বেড়ে যাচ্চে হে?

হরিশ অধিকাংশ স্থলেই জবাব দিত না, কেবল খোঁচা বেশি করিয়া বিঁধিলেই বলিত, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করতে পার ত তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি।

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা! বৃথা! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

তিন

সেবার বসন্ত রোগে লোক মরিতে লাগিল খুব বেশি। হরিশকেও রোগে ধরিল। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, কহিলেন, মারাত্মক। রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন, নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘুচোবে সাধ্যি কার? তোমরা ওঁকে দেখো, আমি চললুম। এই বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িল। কহিল, উনি বাঁচেন ত আবার বাড়ি ফিরব, নইলে এইখান থেকে ওঁর সঙ্গে যাব।

সাত দিনের মধ্যে দেবতার চরণামৃত ভিন্ন কেহ তাহাকে জল পর্যন্ত খাওয়াইতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া বলিলেন, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েছেন, এবার তুমি ঘরে চল।

লোকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা পায়ের ধূলা লইল, তাহার মাথায় থাবা থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিল, কহিল, মানুষ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—! বৃদ্ধেরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে, না কলিতে ধর্ম গেছে বলেই একেবারে ষোলো আনা গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো!

বন্ধুরা লাইব্রেরি-ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধে আর মানুষে স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে ত আমরাও করেছি, কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল কেন হরিশ সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকত না।

বীরেন উকিল ভদ্রলোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিল, আমি জানতাম হরিশ মরতেই

পারে না। সত্যিকার সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে? বাড়ি থেকে বলে গেল, যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই ত—উঃ। শরীর শিউরে ওঠে।

তারিণী চাটুয্যের বয়স হইয়াছে, আফিংখোর লোক; একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শাস্ত্রমতে সহধর্মিণী কথাটা ভারী শক্ত। আমার দেখ না কেবল মেয়েই সাতটা। বিয়ে দিতে দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভাল হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইল তখন কত লোকে যে তাহাকে অভিনন্দিত করিল তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে অনেক লজ্জা দিয়েছি, মাপ ক'রো। লক্ষ কেন, কোটি কোটির মধ্যেও তোমার মত ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিল, সীতা-সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই, স্বরাজ-ফরাজ যাই-ই বল, কিছুতেই হবে না মেয়েদের যতদিন না আবার তেমনি তৈরি করতে পারব। আমার ত মনে হয় শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ-নারী-শিক্ষা-সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন; এবং যে আদর্শ মহিলা তার পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁর নাম ত আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে বলিলেন, সেই সঙ্গে একটা পণ-প্রথা-নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার ত ছেলেবেলায় খাসা লেখার হাত ছিল, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোন কথারই জবাব দিতে পারিল না, কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল।

চার

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত অন্যান্য পুত্রদের বিষয়-সংক্রান্ত মামলা বাধিয়াছিল। হরিশ ছিল বিধবার উকিল। জমিদারের আমলা কে যে কোন্ পক্ষে জানা কঠিন বলিয়া গোপনে পরামর্শের জন্য বিধবা নিজেই ইতিপূর্বে দুই-একবার উকিলের বাড়ি আসিয়াছিলেন। আজ সকালেও তাঁহার গাড়ি আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিল। হরিশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইলেন। আলোচনা পাছে ও-ঘরে মুহুরির কানে যায়, এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিলেন। বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠের শব্দ আসিল, আমি সব শুনেচি।

বিধবা চমকিয়া উঠিলেন। হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল।

একজোড়া অতি-সতর্ক চক্ষু-কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ কথা সে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়াছিল।

পর্দা ঠেলিয়া নির্মলা রণমূর্তিতে বাহির হইয়া আসিল, হাত নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, ফুসফুস করে কথা কয়ে আমাকে ফাঁকি দেবে? মনেও ক'রো না! কৈ, আমার সঙ্গে ত কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখিনি!

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিলেন, এ কি কাণ্ড হরিশবাবু?

হরিশ বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পাগল।

নির্মলা কহিল, পাগল? পাগলই বটে! কিন্তু করলে কে শুনি? এই বলিয়া সে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গাড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপঢিপ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল। মুহুরি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, একজন জুনিয়ার উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিল, সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, বোস কোম্পানির বিল-সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল, এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—আমি সব জানি! আমি সব বুঝি! থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সতী কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বৈ না দুই জেনে থাকি, যদি—

এদিকে বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কি ব্যাপার হরিশবাবু! এ কি দুর্নাম দেওয়া—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোন প্রতিবাদ করিল না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও না কিসের জন্য?

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্যসাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামুনঠাকুর রূপার বাটিতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিল। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্মলা কোনদিন জলস্পর্শ করিত না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিল তাহার এই দুঃখময় দুর্ভর জীবনের অবসান হইবে কবে? এমনি অনেকদিন অনেক রকমেই ভাবিয়াছে, কিন্তু

তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোন পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।

পাঁচ

বছর দুই গত হইয়াছে। নির্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, খবরের কাগজের খবর ঝুটা নয়। লাবণ্য যথার্থই পাবনার মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোটবোন উমাকে জানাইল যে, রাত্রের ট্রেনে তাহাকে বিশেষ জরুরি কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধ হয় দিন-চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন-পনরো হইল স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে স্টেশন দূরে,—রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পরে সে মকদ্দমার দরকারী কাগজপত্র হ্যান্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিল, নির্মলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আজ কলকাতায় যাচ্চ নাকি?

হরিশ কহিল, হুঁ।

কেন?

কেন আবার কি? মক্কেলের কাজ—হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে? গিয়ে কোথায় থাকবে শুনি?

নির্মলা কহিল, যেখানে হোক। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভাল, এবং সতী স্ত্রীরই উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। কহিল, তোমার লজ্জা না থাক, আমার আছে। আমি গাছতলার পরিবর্তে আপাততঃ কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠব স্থির করেছি।

নির্মলা বলিল, তাহলে ত ভালই হ'লো। তাঁর বাড়িতেও স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

হরিশ কহিল, না, সে হবে না। বলা নেই কহা নেই, বিনা আহ্বানে পরের বাড়ি তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি উঠতে পারব না।

নির্মলা বলিল, পারবে না সে জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যর ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল। হাত-মুখ নাড়িয়া চিৎকার করিয়া কহিল, তুমি যেমন নোংরা তেমনি মন্দ। সে বিধবা ভদ্রমহিলা, আমিই বা সেখানে যাব কেন, সেই বা আমাকে যেতে বলবে কেন? তা ছাড়া, আমার সময় বা কৈ? কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে ত নিঃশ্বাস ফেলবারও ফুরসত পাব না।

পাবে গো পাবে।—এই বলিয়া নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন-তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিল, চার-পাঁচ দিন বলে গেলে, তিন দিনেই ফিরে এলে যে বড়?

হরিশ কহিল, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্মলা জোর করিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি?

হরিশ কহিল, না।

নির্মলা অতিশয় ভালোমানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতাতেই যদি গেলে একবার খবর নিলে না কেন?

হরিশ জবাব দিল, সময় পাইনি।

অত কাছাকাছি গেলে, সময় একটুখানি করে নিলেই হ'তো। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাস-খানেক পরে একদিন আদালতে বাহির হইবার সময়ে হরিশ ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, আজ আমার ফিরতে বোধ করি একটু রাত হয়ে যাবে উমা।

কেন দাদা?

উমা কাছেই ছিল, আস্তে বলিলেই চলিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে চড়াইয়া অদৃশ্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হরিশ উত্তর দিল, যোগীনবাবুর বাড়িতে একটা জরুরি পরামর্শ আছে, দেরী হয়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইল। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল, যোগীনবাবুর বাড়ি থেকে এলে বুঝি?

আবদুল কহিল, নেহি মাইজী, স্টেশনসে আতেহেঁ।

ইস্টিশান? ইস্টিশান কেন? গাড়িতে কেউ এলো বুঝি?

আবদুল কহিল, কলকত্তাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে? বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন বুঝি?

আবদুল 'হাঁ' বলিয়া জবাব দিয়া গাড়ি আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই।

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলে লইয়া এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিল, তাহাকে কহিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। একবার সে এমনও বলিতে চাহিল যে, এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

বছর-দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিল। ছেলেকে খাবার খাইতে দিল এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইল। কহিল, আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য ইহার উত্তর দিয়া বলিল, হরিশবাবুর মুখে শুনেছিলাম আপনি ক্রমাগত বার-ব্রত আর উপবাস করে করে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। এখনো ত বেশ ভাল দেখাচ্চে না।

নির্মলা সহাস্যে কহিল, বাড়ানো কথা। কিন্তু এ আবার উনি কবে বললেন? হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কহিল, এবার কলকাতায়। খেতে বসে কেবল আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে কিনা। ছাতের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে শোনা যায়।

নির্মলা বলিল, খুব সুবিধে ত?

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতেই শুধু হয়নি, ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমত ধরে আনতে হ'তো।

বটে!

লাবণ্য বলিল, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই। ব্রাহ্মদের ছোঁওয়া খান না,—আমার পিসিমার হাতে পর্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রেঁধে নিজে পরিবেশন করতে হ'তো। এই বলিয়া সে হাসিমুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন ত? আমি কি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া?

হরিশের সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতে লাগিল, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মনে হইল, এতদিনে মা বসুমাতা দয়া করিয়া বোধ হয় তাহাকে জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, নির্মলা আজ ভয়ঙ্কর উন্মাদ কাণ্ড কিছুএকটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিল। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধ হয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হরিশ বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ পাংশুমুখে বসিয়া রহিল। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্বাহ্ণে সতর্ক করিবার কথা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-অবমাননাকর ও একান্ত মর্যাদাহীন লুকোচুরির প্রস্তাব সে কোনমতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যেবাদী! এত মিথ্যে কথা বল!

হরিশ চোখ রাঙ্গাইয়া লাফাইয়া উঠিল,—বেশ করি বলি। আমার খুশি।

নির্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, বল, যত ইচ্ছে মিথ্যে বল, যত খুশি আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়মনে সতী হই,—আমার জন্যে তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে! এই বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিল, এখন সেটা দৃঢ়তর হইল—এইমাত্র। নীচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায় আসে, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময়ে একবার করিয়া ক্লাবে গিয়া বসিত, এখন সেটুকুও বন্ধ হইয়াছে। কারণ, শহরের সেইদিকে লাবণ্যর বাসা। তাহার মনে হয় পতিপ্রাণা ভার্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আরশির দিকে চাহিয়া

তাহার মনে হইত সতীসাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর মেদ-মজ্জা-মাংস শুষ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার আলমারির মধ্যে একখানা কালী সিংহের মহাভারত ছিল, সময় যখন কাটিত না তখন তাহা হইতে সে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িত। কি তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী। স্বামী পাপী-তাপী যাহাই হউক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ-মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকাল তাহারা একত্রে বাস করে।কল্পকাল যে ঠিক কত হরিশ জানিত না। কিন্তু সে যে কম নহে, এবং মুনি-ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিত। কিন্তু কোন পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যা-হউক একটা ছাড়-রফা করিয়া ফেলিত; মুসলমানদের হইলে তিন তালাক দিয়া বহুপূর্বেই চুকাইয়া ফেলিত; কিন্তু নিরীহ, একপত্নীব্রত ভদ্র বাঙালী—না, কোন উপায় নেই। ইংরাজীশিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে,—বিশেষতঃ নির্মলা, চন্দ্র-সূর্য যাহার মুখ দেখিতে পায় না, অতি বড় শত্রু যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিতে পারে না, বস্তুতঃ স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকেই পরিত্যাগ! বাপ্‌রে! নির্মল, নিষ্কলুষ হিন্দুসমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে? দেশের লোকে খাই খাই করিয়া হয়ত তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে চোখ-কান গরম হইয়া উঠিত, বিছানা ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকি রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিত।

এমনি করিয়া বোধ হয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিল, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। কহিল, জবাবের জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যের হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি আমার খুললে কে?

ঝি কহিল, মা।

হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিল লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটিবারও খবর নিলেন না আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ, বেশ জানেন এ-বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক, এ-যাত্রা আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে-নালিশের জন্যে নয়। আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরত একবার এসে তাকে আশীর্বাদ করে যাবেন। এই ভিক্ষা।—লাবণ্য।

পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এইখানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান-বাজনার আয়োজনও আছে।

চিঠি পড়িয়া বোধ করি সে ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল।হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নিচু করিল। অর্থাৎ বাটির দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাশার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। একমুহূর্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিল—ইহার কি সীমা নাই? যতই সহিতেছি, ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে?

জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি কে এনেছে?

তাঁদের বাড়ির ঝি।

হরিশ কহিল, তাকে বলে দাও গে আমি কোর্টের ফেরত যাব। এই বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিল।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরিতে হরিশের বস্তুতঃ অনেক রাত্রিই হইল। গাড়ি হইতে নামিতেই দেখিল তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্মলা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে।

ছয়

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছেন। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, বোধ হয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে,—বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিল, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন কাছে কাছে থেকে দিন-দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

সেদিন বার-লাইব্রেরির ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠিল। ভক্ত বীরেন কহিল, আমার গুরুদেব স্বামিজী বলেন, বীরেন, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যান্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা বিশ্বাস করলে না, বললে, হরিশ এ-কাজ করতেই পারে না। এখন দেখলে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম কর না।

ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ—হরিশটা কি স্কাউন্ড্রেল! ও-রকম সতীসাধ্বী স্ত্রী যার, কিন্তু মজা দেখেচ সংসারে? বদমাইশগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ-রকম স্ত্রী জোটে!

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহে। আমার ত মাথার চুল পেকে গেল, কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। অথচ আমারই হ'লো সাত-সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হিসাবে লাবণ্যপ্রভা মহিলাটি দেখচি একেবারে আদর্শ! গভর্নমেন্টে বোধ করি মুভ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যবসোলিউট্‌লি নেসেসরি!

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইল না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে শহরে কাহারও আর বাকি রহিল না। এবং সুহৃদ্‌বর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।

হরিশ কহিল, পাগল!

উমা কহিল, পাগল কেন? আমাদের দেশে ত পুরুষের বহুবিবাহ ছিল।

হরিশ কহিল, তখন আমরা বর্বর ছিলাম।

উমা জিদ করিয়া বলিল, বর্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানে ত আমি ত জানি। সমস্ত জীবনটা কি এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিল, উপায় কি বোন? স্ত্রী ত্যাগ করে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের ত নেই। তোর বৌদিরও যদি এ-পথ খোলা থাকত তোর কথায় রাজি হতাম উমা।

তুমি কি যে বল দাদা!—এই বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী বসিয়া রহিল। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল একটি কথাই বারংবার উত্থিত হইতে লাগিল, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।

তাহার বসিবার ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ভিখারীর দল কীর্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সেকালে এ অভিযোগের কিরূপ উত্তর দূতীর মিলিয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু একালে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো দূতী, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝবে না—বললেও না। কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশ' বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। কংস-টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, তবু ত তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলত। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।